মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপ্‌জনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী সংস্কৃতি ও তিস্তা বুড়ি পূজা

কালীকৃষ্ণ সূত্রধর

ভারতবর্ষ নদী মাতৃক দেশ। ভারতের বেশীরভাগ বড় বড় শহর ও নগর নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। নদীকে কেন্দ্র করেই লোক বসতি, লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানব সমাজ যুগ যুগ ধরে নদীকে মাতৃ রুপে গণ্য করে থাকে এবং তারা নদীকে মাতৃ রুপে পূজিত করে থাকে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষের বেশীরভাগ তীর্থ কেন্দ্রগুলি নদীর উপর কেন্দ্র করেই তাঁর সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পরিমন্ডল গড়ে তুলেছে। যেমন, (১) কেদারনাথ মন্দির, যেটি বর্তমান উত্তরাখণ্ড রাজ্যের মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত, (২) বদ্রীনাথ মন্দির, যেটি উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল জেলার অলকানন্দ নদীর তীরে অবস্থিত। ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা ও তার উপনদীগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শহর ও নগর গড়ে উঠেছিল।

এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তার উৎপত্তি, নামকরণ নিয়ে আলোচনা করব। তিস্তা নদী উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। এই নদীকে কেন্দ্র করেই উত্তরবঙ্গের জনজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রগুলি এই পবিত্র নদীর তীরে অবস্থিত। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানায় অবস্থিত উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম শৈব মন্দির জল্পেশ, জটিলেশ্বর ও বটেশ্বর মন্দিরগুলি তিস্তা নদীর তীরেই অবস্থিত। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তিস্তা নদী সবথেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিস্তা নদী উত্তরবঙ্গের জনবসতি, কৃষির প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং এই অঞ্চলের সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির উপর তিস্তা নদীর প্রভাব অপরিসীম।

তিস্তা নদীর তীরে বসবাসকারী প্রধান জনগোষ্ঠী হল রাজবংশী সম্প্রদায়। তারা মূলত চাষবাস করেই জীবন ধারণ করে থাকে। তারা সারা বছর তিস্তার জলের উপর নির্ভর করেই চাষবাস করে। তাই তাদের কাছে তিস্তা শুধুমাত্র একটি নদীর নাম নয়, তারা তিস্তা নদীকে মাতৃ রুপে গণ্য করেন। রাজবংশীদের কাছে তিস্তা নদীর স্থান খুব উচ্চে এবং প্রতিটি গ্রামে তিস্তামার পূজা হয়।

রাজবংশীরা কৃষিজীবী। তিস্তার তিন ধারা, উত্তরবঙ্গের প্রধান কৃষি ব্যবস্থাকে গঠন করেছে এবং সম্ভবত এই কারণেই কৃষিজীবী মানুষের কাছে তিস্তা পবিত্র নদী। পবিত্র তিস্তা নদীকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিস্তা বুড়ি নামক দেবতার পূজা হয়। রাজবংশী সমাজ প্রধানত তিস্তা বুড়ির পূজা করে থাকে।[1] উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী জনগণ সাধারণত তিস্তা বুড়ির পূজা করে থাকে।

তিস্তা নদী উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদঃ- তিস্তা নদী ভারত-বাংলাদেশের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। তিস্তা নদী ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। তিস্তা নদী সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান নদী। এই নদীকে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের জীবনরেখাও বলা হয়। তিস্তা নদীর উৎস উত্তর সিকিমের হিমালয় পর্বতমালার ৫,৩৩০ মিটার (১৭,৪৮৭ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত সো লামো হ্রদে। তিস্তা নদী ছাঙ্গু, ইউমথাং ও ে◻ংকিয়া লা পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন ছোট ছোট নদীর জলে পুষ্ট। সিকিমের রংপো ও পশ্চিমবঙ্গের তিস্তাবাজার শহরের মাঝের অংশে তিস্তা নদীই উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করছে। এটি দার্জিলিং-এ অবস্থিত শিভকগোলা নামে পরিচিত একটি গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তিস্তা সেতুটি দার্জিলিং ও কালিম্পং শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। দার্জিলিং-এ তিস্তা তার প্রধান উপনদী রঙ্গিতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে তিস্তা একটি বন্য নদী হিসেবে পরিচিত, কারণ এর উপত্যকাগুলি ঘনবন দ্বারা আচ্ছাদিত। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা থেকে প্রথমে তিস্তা নদী প্রবাহটি সমভূমিতে নেমে আসে এবং পরে শিলিগুড়ি শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে সেবকের করোনেশন সেতু পেরিয়ে তিস্তা নদী সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। তারপর তিস্তা নদী পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশের রংপুর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশেছে। অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষ দশক পর্যন্ত এই ধারাটি বিভিন্ন নদীপ্রবাহের মাধ্যমে গঙ্গা নদীতে প্রবাহিত হতো। ১৭৮৭ সালের অতিবৃষ্টির ফলে তিস্তা নদীতে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সময় নদীটি গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান বাংলাদেশের লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে

চিলমারী নদী বন্দরের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। তিস্তা নদীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩১৫ কি.মি. তার মধ্যে ১১৫ কি.মি. বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত। তিস্তা একসময় করতোয়া নদীর মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং এর অংশবিশেষ এখনও 'বুড়ি তিস্তা' নামে পরিচিত।

তিস্তা নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে ঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'তিস্তা করতোয়ার রূপ-রেখা' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, *"বহুযুগ গত হয়েছে। সিকিম-তিব্বত সঙ্গমে চোল পর্বতের সুন্দর তুষারাবৃত চমলহরি শৃঙ্গ সমুদ্র থেকে ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে দুটি বরফের ঝরণা পাঠিয়ে দিয়েছিল। এরা বহু পাহাড়ী পথ ঘুরে ১৪,৯০০ ফুটে নেমে এসে মিশে গেল ছালামো হ্রদে। এই পাহাড় দুটির নাম হচ্ছে লাচেন-ছু পশ্চিম দিকে ও লাচিং-ছু পূব দিকের ঝরণা। তিব্বতী ভাষায় 'ছু' মানে ছোট ঝরণা। ছালামো হ্রদটি দেখতে খুবই সুন্দর, চুংথাং জনপদের কাছেই। এই হ্রদ থেকে ছোট্ট তিস্তা নদীটি পাহাড় কেটে পথ করে নেমে আসতে লাগল। এখানে ছোট একটি ঝরণা 'দি-ছু' তিস্তার সাথে মিশে গেল। সিকিম কালিম্পোং সীমান্তে 'রংপো-ছু' এসে মিশলো। তারপর তিস্তা বাজারের কাছে 'রঙ্গিত' এর সাথে দেখা। এখন অনেক বড় হয়েছে। দু'ধারের উঁচু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বেগে চলেছে। পথে আরও বন্ধু জুটলো - রিলে, রিয়াং ও কালিঝোড়া। তারপর শিবক-গোলা গিরিবর্ত্ম দিয়ে নেমে পড়লো পাহাড় থেকে সমতলে, বতমান য়াসগামী রেল সেতুটির নীচেই। এখানে শিবক-ঝোড়া নদীটি তিস্তায় সাথে জুটে গেল। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে গ্রামবাসীরা তিস্তাকে তাদের পছন্দ মত নাম দিয়েছে, যেমন স্যাং-ছু রং-নি-উং, রঙ্গ; দিসতা, তিসতা, সর্বশেষে নীচে এসে ত্রি-স্রো-তা"*।[2]

তিস্তা নদীর উৎপত্তি ও গতিপথ সম্পর্কে কোচবিহার গেজেটিয়াস থেকে জানা যায়, *"The Tista takes its rise in lake Chalamu and has another source below Kanchanjunga in Sikkim, flowing through Sikkim, Darjiling and Jalpaiguri districts in enters Kochbihar district near taluk Baxiganj. It flows for about 15 miles in this district*

and separates Haldibari from Mekhliganj thana. It passes out of the district by Taluk Kuchlibari to flow into the Rangpur district of Bangladesh".[3]

তিস্তা নদীর উৎপত্তি, গতিপথ ও বিস্তার সম্পর্কে JOHN F. GRUNING সাহেব "EASTERN BENGAL AND ASSAM DISTRICT GAZETTEERS- JALPAIGURI" তে লিখেছেন যে,*"The Tista is the largest river in the district. It rises on the far side of the Himālayas and, after passing through Sikkim, bursts through the mountain barrier and enters the plains through a gorge known as the Sivok Gola pass. It then traverses the Darjeeling Tarai and enters the Jalpaiguri district at its north-west corner. For some distance from this point its bed is stony and it contains little water during the dry season, while the swiftness of its current and the numerous rapids render it useless for navigation during the rains. At Jalpāiguri and for a considerable distance above it, large boats can navigate the river all the year round though it is always dangerous in a heavy flood, when the ferry boats between Jalpaiguri and Barnes Junction often have to stop working and the only way to reach the Western Duārs is by rail vid Parbatipur and Lālmanir Junctions. It has no tributaries of any importance on the right or west bank; on the left bank the principal tributaries are the Lesu or Lish, the Ghish and the Dhalla rivers. The Dhallā is formed by the confluence of the Chel, Māl and Neorā rivers and brings down a considerable volume of water. The Tista forms the boundary of the Western Duārs, dividing it from the permanently settled portion of the district which formerly belonged to Rangpur; it enters the Rangpur district from Pātgrām and falls into the Brāhmaputra a little above the town of Rāniganj."*[4]

‘তিস্তা’ নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন গবেষকদের মতবাদঃ- উত্তরবঙ্গে তিস্তা নদীটির নামকরন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলিতেও এর উৎপত্তি ও নামকরণ নিয়েও নানাজনের নানা মত আছে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে তিস্তা নদী দেবী পার্বতীর স্তন থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নদীটির বাংলা নাম ‘তিস্তা’ এসেছে ‘ত্রি-স্রোতা’ বা ‘তিন প্রবাহ’ থেকে। ঃ গিরিজাশঙ্কর রায় লিখেছেন যে,*“ত্রিস্রোতা নামটি অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে নদীটির তিনটি বিশিষ্ট ধারা বর্তমান ছিল। বিশেষজ্ঞগণের অনুমানে বিভিন্ন সময়ে নিম্নরূপে তিনটি ধারা প্রবাহিত হইত:- হলদিবাড়ীর পশ্চিম দিয়া জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সীমানা বরাবর বুড়ী-তিস্তার একটি ধারা, দেওয়ানগঞ্জের পূর্বদিক দিয়া অন্য ধারা এবং মেখলীগঞ্জের নিকট হইয়া তৃতীয় ধারাটি প্রবাহিত হইত। মহানন্দার উপনদী পুনর্ভবার একটি ধারা, চলনবিলে পতিতা আত্রাই নদীর অন্য ধারা এবং করতোয়া নামে অন্য একটি বিশিষ্ট নদীর ধারা। গঙ্গার উপনদী মহানন্দার একটি ধারা, ব্রহ্মপুত্র নদের উপনদী ধরলার একটি ধারা এবং পুনর্ভবার তৃতীয় ধারা”*।[5]

ঋগ্বেদে উল্লিখিত “সদানীর” নদীটি কালিকা পুরাণ মতে পার্বতীর স্তন ধারা থেকে উৎপন্ন। ঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর ‘তিস্তা করতোয়ার রূপ-রেখা’ প্রবন্ধে লিখেছেন যে, *“প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঋক-বেদে এই নদীটিকে বলা হয়েছে ‘সদানীর’। বরফের পাহাড় থেকে উঠেছে, সারা বছরই জল থাকতো, তাই নাম হল ‘সদানীর’। নামটি ‘সদা চঞ্চল’ হলেই ভাল হত। ঋক্ বেদেই আছে কোশলের রাজা তাঁর প্রধান পুরোহিতকে সাথে নিয়ে বৈদিক হিন্দু ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। এই ‘সদানীর’ তখন প্রাগজ্যোতীষপুরের পশ্চিম সীমানা। এখানে পনি জাতির সাথে যুদ্ধে কোশলরাজ হেরে গিয়ে পিছু হটলেন। যাবার সময় এদের অসুর নাম দিয়ে গেলেন, বোধ হয় রেগে গিয়েই। এর পরে শতপথ ব্রাহ্মণে, স্কন্দ পুরাণে এই ‘সদানীর’ নামটি পাওয়া যায়। পুরাণের সময়ে এই নদীর নাম হলো ‘করতোয়া’। তাই এখানে দেখি করতোয়া মাহাত্ম। মহাভারতের বনপর্বে এই করতোয়া হয়েছে পূণ্যতোয়া। মৌর্য্য লিপিতে দেখা যায় পৌণ্ড্র দেশের মহাস্থান গড় (এখন বগুড়ায়) পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা করতোয়া*

অতিক্রম করে প্রাগজ্যোতীষে গিয়েছিলেন। প্রায় তিন হাজার বছর আগে বোদো জাতি এই নদীর নাম দেয় তি-স্তা' বা 'দি-স্তা। বোদো ভাষায় 'তি' ও 'দি' শব্দের অর্থ জল। মনে হয় 'সদানীরের' বোদো অনুবাদ। কোচেরা এদেশে অর্থাৎ প্রাগজ্যোতীষের কামপীঠে আসবার পর সমতলের তিস্তা-করতোয়ার নাম হলো কোত্তো, কিন্তু পাহাড়ের ওপরের অংশটির নাম তিস্তাই থেকে গেল। পাহাড়ের ওপরে এই তিস্তার আরও অনেক নাম হয়েছে।"[6]

তিস্তাবুড়ি পূজাঃ- রাজবংশীদের কাছে তিস্তা নদীর স্থান খুব উচ্চে এবং উত্তরবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে তিস্তামার পূজা হয়। রাজবংশীরা সাধারণত কৃষিজীবী। তিস্তার তিন ধারা, উত্তরবঙ্গের প্রধান কৃষি ব্যবস্থাকে গঠন করেছে এবং সম্ভবত এই কারণেই কৃষিজীবী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তিস্তা পবিত্র নদী রুপে বিবেচিত হয়ে থাকে। পবিত্র তিস্তা নদীকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিস্তা বুড়ি নামক দেবতার পুজা হয়। রাজবংশী সমাজ প্রধানত তিস্তা বুড়ির পূজা করে থাকে। আমাদের দেশে তো বটেই বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বেশীরভাগ নদীরই একটা করে দেবতা আছে। তারই নির্দেশে নদীটি চলে বলে সেখানকার বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কাছে এই ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তাই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগণ খুবই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে তিস্তা বুড়ির পূজা করে থাকে। তবে মাঝে তিস্তা বুড়ির পূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের ধারনা এর ফলে উত্তরবঙ্গবাসীদের তিস্তা নদীর ভয়ঙ্কর বন্যার সন্মুক্ষীন হতে হয়েছিল। তাদের মতে তিস্তা বুড়ির পূজা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার ফলে দেবীর ক্রোধ হয়েছে। তাই বছর বছর এত বন্যা হয়ে থাকে।

তিস্তাবুড়ি ধারনাঃ- রাজবংশী সমাজে 'তিস্তাবুড়ি' মার পূজা করার ধারনাটি কোথা থেকে এল তারও একটা ইতিহাস আছে। 'তিস্তাবুড়ি' ধারণাটির একটি চিত্র স্যার জোসেফ লটন হুকারের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তার বঙ্গানুবাদ করলে নদীর উৎপত্তিস্থলে ও পরবর্তী ৪ মাইল ভাটি পর্যন্ত জলস্রোতে মানুষের মাথার আকৃতির মতো কিছু কিছু বোল্ডার দেখা যায়। নৌকার মাঝিরা এমন এক সুবিশাল পাথরের চাঁইয়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল যা একটা মানুষের শরীরের মতো ও সুবিশাল। যে নদীগর্ভে মানবাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের ধড় ও শিরের উজ্জ্বল উপস্থিতি, সে নদীকে 'তিস্তা

বুড়ি' ভেবে নিতে মানুষের দ্বিধা করে না। সমতলের কাসিয়াবাড়ি থেকে ঘোড়ামারা হয়ে চিলাহাটি পর্যন্ত তিস্তা স্থির, স্থিতধী, শান্ত তেমনই সমতলের তিস্তা বড্ড নীরব। পর্বতে কিশোর, যৌবন পেরিয়ে সমতলে বার্ধক্যে উপনীত নদী। বিশিষ্ট গবেষক গিরিজাশংকর রায় লিখছেন "তিস্তার নামে যে নদীমাতৃকার কল্পনা করা হয় তা হচ্ছে তিস্তার বৃদ্ধকালের তাই সে তিস্তাবুড়ী।" অশীতিপর বৃদ্ধ', পরিধানে সাদা শাড়ী, মাথায় সমস্ত চুল শান পাটের মত সাদা, হাতে একটি লাঠি, সেই লাঠিতে ভর দেওয়ার জন্য একটু নুইয়া-পড়া ভঙ্গী, দন্তহীন মুখে একটু স্মিতহাসি- এই হইল রাজবংশীদের ধারনায় তিস্তাবুড়ীর মূর্তির রূপ। কিন্তু বৃদ্ধা হইলে হইবে কী! তাহার প্লাবনের প্রাবল্য যৌবনোন্মাদনার সঙ্গে তুলনীয়। তাই এতদঞ্চলের ভাষায় প্রচলিত একটি গানে বলা হইতেছে:-

"সগায় কাছে তিস্তাবুড়ী,

বুড়ী না হয় জুয়ান-চেঙেরী।"

অর্থাৎ সকলে তিস্তাকে বুড়ী বলিতেছে, কিন্তু সে বুড়ী নহে, যুবতী বালিকা। নদীর ভয়াল রূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবির মনে এই অভিব্যক্তি জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়"।[7]

পূজার সময়কালঃ- প্রতি বছর বৈশাখ মাসে তিস্তাবুড়ির পূজা হয়। তিস্তাবুড়ির পূজাকে মেচেনী খেলা বলা হয়ে থাকে। ঃ চারুচন্দ্র সান্যাল রচিত "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী" গ্রন্থে লিখিত আছে, "বৈশাখের (এপ্রিল-মে) প্রথম দিনে তিস্তাবুড়ির নামে ঘট পাতা হয়, ঘট সাধারণ ভাবে লা বলে পরিচিত"।[8] যদি গ্রামে বা যে বাড়িতে পূজা হবে সেখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তবে সেই মাসের অন্য যে-কোনও দিন লা পাতা যায়। বাঁশের জালি দিয়ে লা তৈরি হয় আর এটা দেখতে অর্ধগোলাকার হাতল যুক্ত ফুলের সাজির মতো। লা প্রতিষ্ঠার দিন সমস্ত বাড়ি ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। প্রতিটি ঘরের মেঝে, ঘরের ভিত, এমনকী ভেতরের উঠোনও সুন্দর করে ধুয়ে দেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে বাড়িকে পরিষ্কার আর পরিপাটি লাগে। বাড়ির বয়স্কা মহিলা উপোস

থাকেন। তিনি স্নান করে, ধোওয়া কাপড় পরে শুদ্ধ হয়ে □লা পরিস্কার করে তার মধ্যে আতপ চাল, ফুল এবং ছোট একটি মাটির পাত্রে তেল সিঁদুরের মিশ্রণ রাখেন। সমস্ত □লাটি লাল কাপড়ে মুড়ে বা ঘরের এক কোণে রাখা হয়, যাতে কোনও অশুদ্ধ লোক এমনকী পরিবারের সদস্যরাও তিস্তাবুড়ির এই প্রতীককে ছুঁতে না পারে। এটা ঘরে একদিন রাখা হয়।

পরের দিন থেকে বাড়ির মেয়েরা গ্রামের প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা করে প্রত্যেক বাড়িতে □লা নিয়ে যায়। এটা মেয়েদেরই ক্রিয়া। □লা নিয়ে যাবার সময় গান গাওয়া হয়। এইভাবে গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা কোনও বাড়িতে এলে মহিলারা আগের থেকে গোবরজল দিয়ে নিকানো ভেতরের উঠোনের ওপর একটা পরিষ্কার কাঠের পিড়া রাখেন। একটা ছাতা খুলে পিড়ার পাশে রেখে, □লাটিকে পিড়ার ওপর খোলা ছাতার ছায়ায় রাখা হয়। তারপর সব মহিলারা নাচ-গান করতে শুরু করেন। পুরুষ কেউ উপস্থিত থাকলে, তাঁরা কক্ষনও নাচেন না। ……. শোভাযাত্রার মেয়েদের হাতে পান সুপুরি দেওয়া হয়। বর্তমানে, বিবাহিত মেয়েদের কপালে তেল সিদুর লেপা হয়। শোভাযাত্রায় দান হিসাবে চাল, সবজি এবং কখনও তিস্তাবুড়ির পূজার জন্য টাকাও দেওয়া হয় আর শোভাযাত্রাকারীদের কাছে দাতারা অনুরোধ করে, তারা যেন দেবীর কাছে তাদের পরিবারের সদস্যদের সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে। তখন □লা বহনকারী একজন □লা থেকে খানিকটা চাল আর ফুল নিয়ে বাড়ির সবচেয়ে জ্যেষ্ঠা মহিলার হাতে সেগুলি দেন। তিনি তখন খানিকটা চাল আর ফুল সমস্ত ঘরের ছাদে ছিটিয়ে দেন। এর ফলে, ভূতপ্রেতের হাত থেকে বাড়ি রক্ষা পেল, এই রকমই তাদের বিশ্বাস। অশুভ আত্মার প্রভাবেই অসুখ-বিসুখ হয়, এর ফলে কারও অসুখ-বিসুখও হবে না বলে তারা বিশ্বাস করেন। রাজবংশী গ্রামবাসীদের এই বিশ্বাস খুব দৃঢ় এবং হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রোথিত। এই শোভাযাত্রা অঞ্চলের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘোরে। সন্ধ্যায় যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ভালা সেখানে ফিরে আসে। □লার সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। তেল ব্যবহার করা হয় না। পরিবারে বা গ্রামে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে এক মাস ধরে এই শোভাযাত্রা চল।[9]

বৈশাখের (মে) মাসের শেষ সপ্তাহে যে-কোনও শনি-মঙ্গলবারে মেয়েরা ভালা নিয়ে শোভাযাত্রা করে নদী বা পুকুর যেটি কাছে, তার তীরে যায়। কলাগাছের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা তৈরি হয়। পাশাপাশি খণ্ডলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, খুলে যাতে না যায় তার জন্য তিন-চারটা বাঁশের বাতা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে, সেটা যাতে জোড়া লাগানো থাকে এবং ভাসতে পারে এমনভাবে আটকিয়ে ভেলা তৈরি করা হয়। এই ভেলায় □ালা বসিয়ে ফুল আর প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়। উপস্থিত সবাই □ালায় আতপ চাল আর ফুল ছিটিয়ে পূজা দেয়। কোনও মন্ত্র নেই। এই শেষ পুজাকে বলে - জাত। এটা হয়ে গেলে, লাল কাপড় খুলে ধুয়ে নেওয়া হয়। একে বলে জাত সিনানি। □ালার সামগ্রী ভেলার পর রেখে □ালাটাও জল দিয়ে ধোওয়া হয়।[10]

দেবীকে একটা পায়রা উৎসর্গ করে সেটা ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর দ্রব্য সামগ্রী এবং প্রদীপসহ □ালাকে গভীর জলে ঠেলে দেওয়া হয়। নদীতে □ালাটি স্রোতে ভেসে যায় আর পুকুরে ঠেলায় যতটা দূরে যাওয়া যায়, ভেলাটি ততদূরেই যায়। এরপর মেয়েরা সবার পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে এবং সবকিছু যদি ঠিক থাকে তবে সামনের বছর আবার পুজো দেবার প্রতিজ্ঞা করে। □ালা এবং লাল কাপড় যত্নে রাখা হয়। এই □ালা একদম ভাঙে না গেলে অন্য নতুন □ালা ব্যবহার করা হয় না। ভেঙে গেলে □ালাটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।[11]

মেচেনী খেলাঃ- তিস্তাবুড়ী পূজার সহিত যে গীতিউৎসব অঙ্গটি টাকার এক পিঠের সহিত অন্য পিঠের সম্পর্কের মত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত উহার নাম মেচেনী খেলা'। তরাই অঞ্চলে ইহাকে বলা হয় ভেদেই খেলা। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে তিস্তানদীর পূঙ্গা ও মেচেনী খেলা সমর্থক ব্যাপার।[12]

□ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রাজবংশী সমাজের উপর মেচ উপজাতির প্রভাবের কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, "উত্তরবাংলার মেচ জাতির সকল বয়সের নারীগণ বৈশাখ মাসে তিস্তানদী বা তিস্তাবুড়ীর মাহাত্ম কীতন করিয়া বাড়ী বাড়ী যে গান গাহিয়া এবং নৃত্য করিয়া বেড়ায়, তাহাকে মেচেনি খেলার গান বলে। একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে, "এর প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করতে

গিয়ে মনে হয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপর মেচদের (একটি আদিবাসী সম্প্রদায়) কিছু প্রভাব পড়েছে। এবং আমরা তাদের যেটাকে গীতি-উৎসব শাখা বলি সেটাই গ্রহণ করে রাজবংশীরা ‘মেচেনী খেলা নামে এক উৎসব প্রচলন করে। অতঃপর সেটাই ‘তিস্তাপুজোয়’ রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ মেচেনী খেলা’ প্রথমস্তরের না হয়ে দ্বিতীয় স্তরের উৎসব। সেটাই তৃতীয় স্তরে ‘তিস্তাপুজো।[13]

জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম □য়ার্সের মহিলারা আতপ চাল, ফুল, বেলপাতা নেবার জন্য □ালার পরিবর্তে সুতির কাপড়ের তৈরি ঝোলা ব্যবহার করে। বৈশাখের শেষ দিনে তারা কোনও নদীর কাছে গিয়ে পূজা করে। একজন দেওধা (পুরোহিত) পূজা করেন। পায়রা ও ছাগল বলি হয়। কখনও দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় আবার কখনও তাদের মুন্ডু কেটে বলি দেওয়া হয়। বলির মাংস বাড়ি এনে রান্না করে খাওয়া হয়। পূজার পর পুরোহিত নাচতে শুরু করেন এবং তাঁর ভর ওঠে। এই সময় তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি উত্তর দেন। অধিকাংশ সময়েই উত্তর সঠিক হয়, অন্তত সেখানে যারা উপস্থিত থাকেন, তারা তাই বিশ্বাস করেন।[14]

পূজার উপকরনঃ- এই পূজা গেরাম পূজার রূপও নিতে পারে যেখানে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। যে-কোনও ব্যক্তি নিজের বাড়িতেও এই পূজা করতে পারেন। দুষ্ট আত্মা, যারা অসুখবিসুখ ঘটায়, তাদের তাড়াবার জন্যই এই পূজা করা হয়। সুতরাং বছরের যে-কোনও মাসে এটি অনুষ্ঠিত হতে পারে। সপ্তাহের যে-কোনও দিনেই, এই পূজা করা যায়। কিন্তু মঙ্গল আর শনি হচ্ছে সবচেয়ে শুভ দিন। বৃহস্পতি আর রবিবার পূজা হলে কোনও প্রাণী বলি দেওয়া হয় না। পূজায় নিম্নলিখিত উপকরণগুলি লাগে: (১) হাঁসের ফল (হাঁসের ড্রিম) (২) পাচ হাত লম্বা কাপড় (৩) মুড়কি আর শাড় (৪) পাঁচ জোড়া সুপুরি (৫) পাঁচ জোড়া পান (৬) কল্কেতে খানিকটা গাজা রেখে তা জ্বালিয়ে পাস কাছে রাখা হয় (৭) কলাপাতায় খানিকটা সিঁদুর (৮) ধুনুচিতে জ্বালানো ধূপ (৯) বেলপাতা ফুল এবং ধুনো (১০) তিন, পাঁচ বা সাত ছাড়া পাকা কলা, আতপ চাল, দই, খই, ঘি,

মধু আর চিনি কলা পাতার ওপর সাজিয়ে পুজার কাছে রাখা হয় (১১) বলির জন্য এক জোড়া পায়রা বা একটা ছাগল (১২) জল এবং অন্যান্য দ্রব্য রাখার জন্য কলাগাছের খোল থেকে তৈরি কয়েকটি ধোনা (১৩) পূজার স্থানে একটি জ্বলন্ত মাটির পিদিম।[15]

তিস্তাবুড়ি মূর্তিঃ- তিস্তাবুড়ি সাদা কাপড় পরিহিতা, লাঠি হাতে একজন বৃদ্ধা। কলাপাতার দাড়া (কাঠি) দিয়ে তৈরি মনুষ্য অবয়ব বা শোলার মূর্তি এমনকী একটি মাটির কলসি দিয়েও মুর্তির কাজ চালানো যায়। শোলা দিয়ে তিস্তাবুড়ির মূর্তি তৈরি করা হয়। মূর্তিটি দেখতে সাদা চুলের বুড়ির মতো যার অবলম্বন একটা লাঠি। কখনও কখনও কলাপাতার খোল দিয়েও মুর্তি তৈরি হয়। সে ক্ষেত্রে একটি কাল্পনিক মানুষের প্রতিমূর্তি গড়া হয়।

পূজার স্থানঃ- উত্তর অথবা পূর্ব দিকে মুখ খোলা সদ্য তৈরি মাটির কুটিরের ভেতর গোবর দিয়ে লেপা উচু মাটির ঢিপিতে তিস্তাবুড়ি বসেন। গারামের স্থানে ছাড়াও প্রত্যেক রাজবংশীর বাড়ীতে বহিরঙ্গণে তিস্তাবুড়ীর থান থাকে। এইরূপ কোন স্থানে অথবা তিস্তানদী কিংবা যে কোন নদীর তীরে, অভাবে কোন জলাশয়ের ধারে তিস্তাবুড়ী পূজার জন্য স্থান নিদিষ্ট করা হয়। পুরোহিত এবং মূর্তির মাঝখানে ধোনায় ভরা জল ফুল রাখা হয়।

পুরোহিতঃ- পুরোহিত রাজবংশী অধিকারী বা হাড়ি সম্প্রদায়ের মালিও হতে পারেন। তিস্তাবুঙী পূজায় অধিকারী নিয়োগ করা হয় না, পরিবর্তে দেওধা বা দেমধ বা দেন্ধা এই পুজা দিয়ে থাকে। শব্দ গুলি দেবআধান বা ঐ জাতীয় কোন শব্দ হতে এসেছে। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর দেউসির মন্ত্রপূত জল নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার মধ্যে তিস্তাবুড়ীর গুণ ও শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই ভরগ্রস্থ লোকটিকে স্থানীয়ভাবে তিস্তাবুড়ীর পাঁচিকা হিসেবে গণ্য করা হয়। পাঁচিকা ব্যতীত যেমন অন্য কারও হাতে অন্ন-গ্রহণ করা উচিত নয়, তেমনই এই দেওধা ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা পুজা দিলে ঐ পূজা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হয় অথবা দেবতা উক্ত পূজা গ্রহণ করেন না এই জাতীয় বিশ্বাস রাজবংশীদের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা যায়।[16]

পূজার পদ্ধতিঃ- প্রসাদে বেলপাতা উৎসর্গ করে এবং পনো থেকে জল নিয়ে ফুল দিয়ে প্রসাদের ওপর ছিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পূজা করা হয়। এরপর অসুস্থ রোগীকে পূজার স্থানে নিয়ে এসে নীচের মন্ত্রটি বলে শান্তি প্রার্থনা করা হয়। রোগ-পীড়া সৃষ্টিকারী অনিষ্ট আত্মাকে তাড়াবার জন্য ধোন থেকে শান্তিজল নিয়ে অসুস্থ রুগির গায়ে এবং সমস্ত বাড়িঘর আর উঠোনে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পূজার পর পুরোহিত নিজের কপালে খানিকটা সিদুর ঘষে, হাতে ধনটি করেন। বাজনার তালে তালে ঢোল, কাসি, যাজে। কিছুক্ষণ পরে পুরোহিতের সে (দ্যাহর হয়) এবং তিনি ঘোরে আচ্ছন্ন হন। তখন তিনি হন বাউরিয়া। তাকে প্রদান উত্তর দিতে থাকেন। যে মানুষ অসুস্থ তার উপর কোন দুষ্ট আত্মা ভর করেছে কি নাম বলেন এবং কীভাবে তাকে তাড়ানো যাবে, তার উপায়ও বলেন। প্রায় সঠিত ভাল প্রশ্নকারীর অতীতের কিছু ঘটনা এবং ভবিষ্যতের ফলাফল বলে দিতে পারেন। কিছু সময় ক্ষম পুরোহিতের এই ঘোর কেটে যায়। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন এবং আচ্ছন্ন অবস্থায় যা বলেছিলেন সব ভুলে যান।[17]

পরিশেষে বলা যায়, তিস্তাবুড়ী পূজা একটি কৃষিকৃত্যবিশেষ। বিভিন্ন কালে তিস্তানদীর যে তিনটি বিশিষ্ট ধারা বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত সেই স্থানগুলির নাম হতেও বুঝতে পারা যায় যে একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে এর অববাহিকা ছিল। তিস্তা তার দুই তীরের অববাহিকার জনপদগুলিতে কদমাক্ত জলের পলি ফেলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়তা করত এবং তাতেই অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেত। সুতরাং শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র সান্যাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন "তিস্তা নদীর তিনটি ধারা উত্তরবঙ্গে প্রধানভাবে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল এবং সম্ভবতঃ এই কারণটির জন্য তিস্তানদী কৃষিনির্ভর সমাজের নিকট পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। আবার এই নদীরই বন্যার প্রবলতা মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অসুবিধার কারণ সৃষ্টি করে তথা ফসলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই পূজা দান করে নদীকে সন্তুষ্ট করবার মনোভাব ইতে যে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল না তা বলতে পারা যায় না। দেওধার নিকট সমবেত পূজার্থীরা যে সকল কামনা-বাসনা জানায় তাতেও নদীর ভবিষ্যত গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করবার প্রার্থনা ও প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ তিস্তাবুড়ী পূজার সৃষ্টিমূলে বন্যাভীতিও একটি অন্যতম কারণ ছিল বলে মনে করা

যেতে পারে। অন্যদিকে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির বাসনা, প্লাবনের প্রবলতা রোধের কামনা, রোগাদি দূরীকরণের ধারণা প্রভৃতির মধ্যে অন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত গোপনে প্রভাব বিস্তার করেছে বলিয়া মনে হয় তাহা হল কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস। কেননা, তিস্তানদীর তার জনপদবাসী রাজবংশীরা বিশ্বাস করে তিস্তাবুড়ীর পূজা করলে বন্যার প্রকোপ থাকে না। তিস্তা নদীর তীরবর্তী অধিবাসীদের মত অন্যত্রও এইরূপ ধারণা সাধারণভাবে প্রবল যে এই পূজা করলে কলেরা ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে না, ব্যধি হতে লোকের নিরাময় হতে পারে। তিস্তাবুড়ী বেঝটিকা নিয়ন্ত্রণকারিনী দেবতাও বটে, তাই ঝড়ের সময় এই দেবতার নাম স্মরণ করলে অচিরাৎ ঝড় বন্ধ হয়ে যায় বলেও রাজবংশীদের বিশ্বাস আছে। এমন কি তিস্তাবুড়ী পূজার অঙ্গানুষ্ঠান মেচেনী খেলার মধ্যেও তাই জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় : "নৃত্যকালে তিস্তানদীর প্রতীক কাষ্ঠানটিকে একটি ছাতা দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হয়। রৌদ্র নদীজলকে শুষ্ক করিয়া তাহাকে পীড়িত করে, এই বিশ্বাস হইতেই তাহাকে ছায়া করিয়া রাখা হয়"।[18] উত্তরবঙ্গের জনজীবনে তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠে।

- **তথ্যসূত্রঃ-**
  - [1] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮৩
  - ,[2] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল (সম্পাদিত) – জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৮৬৯-১৯৬৮, জলপাইগুড়ি, প্রবন্ধ- 'তিস্তা করতোয়ার রূপ-রেখা', পৃষ্ঠা-৩৪৯
  - [3] Durga Das Majumdar, IAS (Retd.), Former State Editor, 'West Bengal,
  - District Gazetters', Koch Bihar, February, 1977, p.8.
  - [4] JOHN F. GRUNING - "EASTERN BENGAL AND ASSAM DISTRICT

- GAZETTEERS - JALPAIGURI, 1911, Pioneer Press, Allahabad, p.7
- [5] ঃ গিরিজাশঙ্কর রায়- ‘উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ’, অপ্রকাশিত
- পি.এইচ.ডি. গবেষণা পত্র, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৯৭
- [6] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল, জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৮৬৯-১৯৬৮, জলপাইগুড়ি, প্রবন্ধ- ‘তিস্তা করতোয়ার রূপ-রেখা’, পৃষ্ঠা- ৩৪৮
- [7] **ডঃ** গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা-৯৭
- [8] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৩,
- [9] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৪,
- [10] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৪,
- [11] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৫,
- [12] **ডঃ** গিরিজাশঙ্কর রায়-পৃষ্ঠা-৯৮
- [13] **ডঃ** গিরিজাশঙ্কর রায়-পৃষ্ঠা-৯৮
- [14] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৫,
- [15] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৬,
- [16] **ডঃ** গিরিজাশঙ্কর রায়-পৃষ্ঠা-১০১
- [17] **ডঃ** চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পৃষ্ঠা-২৮৮,
- [18] **ডঃ** গিরিজাশঙ্কর রায়-পৃষ্ঠা-১০২